প্রাণিসম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণতার পথে বাংলাদেশ

সেলিনা আক্তার

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গবাদিপশু একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপখাত। সাধারণত গবাদিপশু বলতে গরু,মহিষ, ছাগল,ভেড়া ইত্যাদি গৃহপালিত পশুকেই বুঝায় যা মানুষের তত্ত্বাবধানে খাদ্য ও অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিপালিত হয়ে থাকে। গবাদি পশু থেকে দুধ মাংস ডিম পাওয়া যায়। এছাড়া জমি চাষ, ফসল মাড়াই, পরিবহণ, সার ও জ্বালানি উৎপাদনে গবাদিপশুর ভূমিকা অপরিসীম। গবাদিপশুর থেকে প্রাপ্ত বর্জ্য যেমন-গোবর জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গবাদিপশুর ভূমিকা অনস্বীকার্য। দারিদ্র্যমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গবাদিপশু অন্যতম হাতিয়ার।

সম্প্রতি ঈদুল আজহায় বাংলাদেশে ৯১ লাখ ৩৬ হাজার ৭৩৪টি পশু কোরবানি হয়েছে। এর মধ্যে গরু ও মহিষ ছিল ৪৭ লাখ ৫ হাজার ১০৬টি, ছাগল ও ভেড়া ৪৪ লাখ ৩০ হাজার ৬৬৮টি এবং অন্যান্য প্রাণী (উট, দুম্বা ইত্যাদি) ৯৬০টি। এ বছর কোরবানির জন্য পশু প্রস্তুত ছিল ১ কোটি ২৪ লাখ ৪৭ হাজার ৩৩৭টি। এর মধ্যে ৫৬ লাখ ২ হাজার ৯০৫টি গরু-মহিষ, ৬৮ লাখ ৩৮ হাজার ৯২০টি ছাগল-ভেড়া এবং ৫ হাজার ৫১২টি অন্যান্য প্রজাতি ছিল।তবে কোরবানির পর ৩৩ লাখ ১০ হাজার ৬০৩টি পশু অবিক্রীত ছিল।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, দেশে গবাদিপশুর উৎপাদন বাড়ছে। সফলতা পাওয়ায় বাণিজ্যিকভাবে পশু মোটাতাজাকরণ ব্যবসায় নামছেন নতুন নতুন খামারি। এক দশকে ১৪২ শতাংশের বেশি গবাদিপশুর উৎপাদন বেড়েছে। তবে জমি-স্বল্পতা ও চারণভূমির অভাব রয়েছে। যে কারণে পশুর সংখ্যা সীমিত রেখে দুধ ও মাংস উৎপাদন বাড়াতে অগ্রাধিকার দিচ্ছে সরকার। ১০ বছরের ব্যবধানে দেশে গবাদিপশুর সংখ্যা বেড়েছে ৪৪ লাখ। অন্যদিকে ১০ বছর আগে মাংস উৎপাদন ছিল ৪৫ লাখ টন, এখন সে পরিমাণ ৮৭ লাখ টন। সে হিসাবে এক দশকে দেশে মাংস উৎপাদন ৪২ লাখ টন বেড়েছে। অর্থাৎ পশুর সংখ্যার চেয়ে বেশি বাড়ছে পশুর মাংস উৎপাদনের পরিমাণ; যার বড় অংশই গরু থেকে আসছে।২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশে জনপ্রতি দৈনিক ১২০ গ্রাম মাংসের চাহিদা হিসাবে, মোট মাংসের চাহিদা প্রায় ৭৪ লাখ ৩৭ হাজার টন হবে। এটি একটি আনুমানিক হিসাব, এবং প্রকৃত চাহিদা আরও বেশি বা কম হতে পারে।

কৃষিশুমারি সাধারণত ১০ বছর পরপর করা হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ২০১৯ সালের শুমারির প্রতিবেদন প্রকাশ করে।দেশে মোট গরুর সংখ্যা ২ কোটি ৯৪ লাখ ৫২ হাজার, যা ২০০৮ সালের শুমারিতে ছিল ২ কোটি ৫৬ লাখ ৭৮ হাজার।১ কোটি ৬৩ লাখ ১৮ হাজার। দেশে ১০ বছরে গরু, মহিষ, ছাগল ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শুমারিতে মোট মোরগ-মুরগীর সংখ্যা দেখানো হয়েছে ১৯ কোটি ৯৪ লাখ ৩ হাজার, যা ২০০৮ সালের শুমারিতে ছিল ৯ কোটি ৭৮ লাখ ১০ হাজার। হাঁসের সংখ্যা বর্তমানে ৭ কোটি ৪৪ লাখ ৯৩ হাজার, যা ২০০৮ সালের শুমারিতে ছিল ৩ কোটি ১৪ লাখ ৩৩ হাজার।

শুধু উৎপাদনেই নয়, গবাদিপশুর জাতগত বৈচিত্র্যের দিক থেকেও বাংলাদেশকে বেশ সমৃদ্ধশালী বলছে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থাসহ (এফএও) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ২০১৭ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ছাগলের সংখ্যা, মাংস ও দুধ উৎপাদনের দিক থেকে বাংলাদেশ বৈশ্বিক সূচকে ধারাবাহিকভাবে ভালো করছে। এ খাতে শীর্ষে রয়েছে ভারত ও চীন। বাংলাদেশ ছাগলের দুধ উৎপাদনে বিশ্বে দ্বিতীয়। আর ছাগলের সংখ্যা ও মাংস উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ। সামগ্রিকভাবে ছাগল উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশ হচ্ছে ভারত ও চীন। আর গরু, ছাগল, মহিষ ও ভেড়া মিলিয়ে গবাদিপশু উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বের ১২তম। আর ছাগলের মাংস উৎপাদনে দেশের অবস্থান সপ্তম। সংখ্যাগত দিক থেকে গরু উৎপাদনেও বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ১২তম।

ঈদকে সামনে রেখে গরু মোটাতাজা করার জন্য খামারিরা কিছু অসাধু চিকিৎসকের পরামর্শে স্টেরয়েড গ্রুপের বিভিন্ন নিষিদ্ধ ওষুধ ব্যবহার করে থাকেন। বাজারে ডেক্সোনা এবং প্রাকটিন ট্যাবলেট জাতীয় বেশ কিছু ওষুধ আছে-যা ভারত থেকে চোরাইপথে আসে। এছাড়া আবার অনেকেই ডেকাসন, ওরাডেক্সন, প্রেডনিসোলন, বেটেননাল, কর্টান, স্টেরয়েড জাতীয় ট্যাবলেট অনেকেই খাওয়ায়।এসব ওষুধ খেলে গরুর কিডনি ও যকৃতের কার্যকারিতা নষ্ট হওয়ার কারণে শরীর থেকে পানি বের হতে পারে না। এ কারণে শোষিত হয়ে পানি সরাসরি গরুর মাংসে চলে যায়। এ কারণে গরু একটু মোটা দেখায়। পাকস্থলীতে ক্ষতের সৃষ্টি হওয়ায় রক্ত পায়খানা শুরু হয়। এ গরু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জবাই না করলে মারা যেতে পারে অথবা এর গোশত কমতে পার। এমন গরুর গোশত খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর, যা মানবদেহে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে। এ ধরনের গরুর গোশত খেলে মানুষের কিডনি, লিভারসহ বিভিন্ন অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনকি ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে।

অসাধু গরু ব্যবসায়ীরা যাতে ওষুধের মাধ্যমে গরু মোটাতাজা করতে না পারে তার জন্য সরকার আইন প্রণয়ন করেছে। পশু খাদ্য আইন, ২০১০-এর ধারা অনুযায়ী, লাইসেন্স ব্যতীত মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন, বা বিতরণ করলে অথবা এই আইনের অন্যান্য বিধান লঙ্ঘন করলে, তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি এই আইন লঙ্ঘন করে, তবে তাকে অনধিক ২ (দুই) বছরের কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হতে পারে।

সরকার মাঠ পর্যায়ে খামারিদের সর্বোচ্চ সহযোগিতার পাশাপাশি মনিটরিংয়ের কাজও করছেন। প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার জন্য দল বেঁধে খামারে খামারে যাচ্ছেন কর্মকর্তারা। গবাদিপশুর খাবার জোগান দেওয়ার জন্য ঘাস উৎপাদনের সহায়তা এবং কৃমিনাশক ভ্যাকসিন কার্যক্রমও চালু রয়েছে। জেলে ও প্রান্তিক মানুষের কাছে বকনা বাছুর বিতরণসহ সরকারের নানাবিধ উদ্যোগের কারণে গবাদিপশু উৎপাদনে নীরব বিপ্লব ঘটেছে।

সরকার লক্ষ্মীপুর, ফরিদপুর, নোয়াখালীর কোম্পানিগঞ্জ, সুবর্ণচর, সিরাজগঞ্জের তাড়াশ, ঝালকাঠির রাজাপুর, নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার ও রাজশাহীর তানোরসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার জেলে ও দরিদ্র পরিবারের মধ্যে লক্ষাধিক বকনা বাছুর বিনামূল্যে দিয়েছে। এছাড়াও ৮-১০টি প্রকল্পে ১০ হাজার কোটি টাকার বেশি খরচ করেছে সরকার।এ প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে- খামারিদের প্রশিক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধি, উন্নত জাতের ঘাস উৎপাদনে বীজ সরবরাহ, টীকা ও কৃমিনাশক ওষুধ বিতরণ। এছাড়া গবাদিপশুর উৎপাদন খাতের চলমান সাফল্য ধরে রাখতে বিভিন্ন অংশীজনদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ, পরামর্শ ও বৈঠক করছেন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।
গবাদিপশু খাতে যে উন্নয়ন ও উৎপাদন বিপ্লব শুরু হয়েছে, তা ধরে রাখতে সরকার বেশ কিছু সময়োপযোগী প্রকল্প চালু রেখেছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকে পিপিআর রোগ নির্মূলে মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, ভোলা ও কুড়িগ্রাম জেলায় ক্ষুরারোগমুক্ত জোন গঠনের কাজ চলছে। এ প্রকল্পে ব্যয় হবে ৩১৬ কোটি ৫৪ লাখ টাকা। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ হবে। এর মাধ্যমে পিপিআর টিকা উৎপাদনে এলআরআই এর সক্ষমতা বাড়ানো হবে।

এছাড়া ঘাস উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ১১৭ কোটি ৪৯ লাখ টাকা ব্যয়ে ৮ হাজার ৯৭০টি উন্নত জাতের ঘাস চাষ প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হচ্ছে। ১৭ হাজার ৯৪০টি খামারে কাঁচা ঘাস সংরক্ষণের জন্য লাগসই প্রযুক্তি চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি ৮৯ হাজার ৭০০ জন প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারিকে প্রাণিপুষ্টি বিষয়ে আধুনিক কৌশল ও পদ্ধতি নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। দেশের ৮টি বিভাগের ৬৪ জেলার ৪৭৫টি উপজেলার ৪ হাজার ৪৮৫টি ইউনিয়নের খামারিরা এই প্রশিক্ষণের আওতায় এসেছেন। এছাড়াও'প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন' প্রকল্পটিও বর্তমানে চলমান রয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ৫ হাজার ৩৮৯ কোটি ৯২ লাখ টাকা। প্রকল্পের মাধ্যমে গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতা অন্তত ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রকল্পের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১ লাখ ৯১ হাজার।

দুধ ও মাংস উৎপাদন বাড়াতে ‘প্রভেন বুল’ তৈরি প্রকল্পও হাতে নিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। চলতি বছরের জুলাই থেকে ২০৩০ সালের জুন পর্যন্ত এ প্রকল্পে ব্যয় হবে ৬৭ কোটি ৪৭ লাখ ৭৩ হাজার টাকা। পাশাপাশি মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পও হাতে নিয়েছে সরকার। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৭২ কোটি ১১ লাখ টাকা। বর্তমানে দেশে নিবন্ধিত খামারের সংখ্যা ৬৬ হাজার ও অনিবন্ধিত ৭০ হাজার। সব মিলিয়ে মোট খামার ১ লাখ ৩৬ হাজার। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত খামারির সংখ্যা ৫ লাখ ৭৭ হাজার ৪১৬ জন।

বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ খাত আজ আর কেবল একটি কৃষিপ্রধান দেশের গৃহপালিত পশুপাখির বিবরণ নয় এটি এখন গ্রামীণ অর্থনীতির চালিকাশক্তি, পুষ্টি নিরাপত্তার অন্যতম ভিত্তি এবং কর্মসংস্থানের বৃহৎ ক্ষেত্র। দুধ, ডিম ও মাংসে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন শুধু আত্মতুষ্টির নয়, বরং এটি একটি সম্ভাবনাময় শিল্পখাতের শক্ত ভিত গড়ে তোলার প্রতিচ্ছবি।তবে এই খাতে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজন তিনটি বিষয় মানসম্মত খামার ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণের বিস্তার, এবং বাজারে অনিয়ন্ত্রিত ওষুধ ব্যবহার রোধে কঠোর নজরদারি। বিশেষ করে ঈদ উপলক্ষ্যে পশু মোটা-তাজাকরণে স্টেরয়েড ও নিষিদ্ধ ওষুধের অপব্যবহার বন্ধে মাঠপর্যায়ে জোরালো পদক্ষেপ জরুরি।

সরকারি নানা প্রশিক্ষণ, প্রকল্প ও আর্থিক সহায়তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তবে এসব উদ্যোগ যেন সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আরও যুগোপযোগী হয় এবং কৃষকের দোরগোড়ায় কার্যকরভাবে পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করাই এখন চ্যালেঞ্জ। প্রাণিসম্পদে এই নীরব বিপ্লবকে আরও বেগবান করতে চাই সংহত কর্মপরিকল্পনা, সুশাসন এবং উৎপাদন-প্রক্রিয়াজাতকরণ-বাজারজাতকরণের মধ্যে সুদৃঢ় সংযোগ। তবেই বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদে শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণই নয় আঞ্চলিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক একটি রফতানিকেন্দ্রিক খাত হিসেবেও গড়ে উঠতে পারে।

#

লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

পিআইডি ফিচার